‘কয়েকজন ব্যারিস্টার বেগম জিয়ার সুনজরে থাকতে বিচারপতিদের বয়স বাড়িয়েছিল, সেখান থেকেই বিপত্তির সূচনা’

সাদেক হোসেন খোকা
মেয়র, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

বিএনপির দুঃসময়ের সারথি সাদেক হোসেন খোকা আবারও আলোচনায়। তবে এবার রাজপথের রাজনীতি দিয়ে নয়, দলের ভেতরে সংস্কার ও পুনর্গঠনের জোরালো গুঞ্জনের অন্যতম উদ্যোগতা হিসেবে আলোচনায়। বিএনপির বর্তমান দুরবস্থা কীভাবে শুরু হলো, এর জন্য কোন নেতার কী দায়, চ্যালেঞ্জের মুখে পড়া খালেদা জিয়ার নেত্রিত্ব, দলের পুনর্গঠনের রেখচিত্র ও বর্তমান সরকারের ৩ মাসের কার্যক্রমের মূল্যায়ন করেছেন তার দীর্ঘ রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে লব্ধ অভিজ্ঞতা দিয়ে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **বদরুল আলম নাবিল** সহযোগিতা **ওমর নাসিফ**

সাপ্তাহিক ২০০০ : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বয়স ৩ মাস অতিক্রম করল এ পর্যায়ে তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

সাদেক হোসেন খোকা : দেশের বড় দুটি রাজনৈতিক দল এবং জোটের অনমনীয় মনোভাব, আগের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে এদের আসতে হয়েছে। দেশ একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বিশেষ কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্তু এগুলো তো তাদের করণীয় ছিল না। নির্বাচন করে তাদের চলে যাওয়ার কথা। এখন এই নির্বাচন কমিশনসহ অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঠিক করা, দেশে ঢালাওভাবে যে দুর্নীতিগুলো জনসম্মুখে চলে এসেছিল (কোন নিয়মনীতি ছিল না), ফেডারেল গভর্নমেন্টের বাইরে অথরিটি সৃষ্টি করা হয়েছিল- এই সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণে এনে দেশে একটি সুষ্ঠু পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য ওনারা কিছু কার্যক্রম শুরু করেছেন। তবে এই কার্যক্রম খুব সঠিক, খুবই সুচিন্তিত এবং খুব এককেন্দ্রিক একটি শৃঙ্খলার মধ্যে হচ্ছে তা কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে না। অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকে তারা মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছেন। যেমন : দেখা গেছে যে গ্রামের বাজার ভেঙে দিচ্ছে। ৫০-৬০ বছরের পুরানো বাজার সরকার ভেঙে দিচ্ছে। এগুলো গড়ে উঠেছিল স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে। এই বাজারগুলো ক্ষতিকর ছিল না। এসব বিষয়ে হাত দেয়ার ফলে সারাদেশে একটা প্যানিক ভাব তৈরি হয়েছে। সবার মধ্যে সঙ্কুচিত মনোভাব। ফলে পুঁজি বিনিয়োগ ও উৎপাদন কার্যক্রম সঙ্কোচনের মধ্যে পড়েছে। আমাদের মতো দরিদ্র দেশের জন্য এই রকম অবস্থা সরকারেরও অনুকূলে নয়। সরকারের এটা কামনা হতে পারে না। সুতরাং এই বিষয়গুলোতে সরকারের আরো চিন্তা-ভাবনা করে এগুনো উচিত।

২০০০ : নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধর দেশের প্রধান দুই দলের নেত্রীর অবস্থান পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নড়বরে হয়ে পরলো, এর কারণ কী?

খোকা : অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয় ৯১, ৯৬ ও ২০০১ সালের ইলেকশন একটা তার পূর্ববর্তীটার চেয়ে ভালো হয়েছে। আমাদের নেত্রীদের মধ্যে ১০০ ভাগ গণতান্ত্রিক মনোভাব কোনকালেই বিদ্যমান ছিল না। ফলে যে পরাজিত হতো তিনিই নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলতেন। কিন্তু বিদেশী পর্যবেক্ষক, মিডিয়া, অন্য রাজনৈতিক দল যারা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন তারা কিন্তু বলতেন নির্বাচন ভালো হয়েছে। প্রধান দুই দলের মনে রাখা উচিত কোনো নির্বাচনে এই সঙ্গে দুই দলের জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এটা কখনও হবে না। কাউকে না কাউকে পরাজিত হতে হবে। তাই পরাজয়টা মেনে নিতে হবে। পরাজয় মেনে পরাজয়ের কারণগুলো বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। তাদের ত্রুটি কি ছিল, জনগণের সঙ্গে তাদের দূরত্বটা কেন হলো? সেসব পর্যালোচনা করে গণমুখী পদক্ষেপ নেয়া উচিত। তা পার্টির মধ্যে থেকেই নেয়া উচিত। পার্টির মধ্যে গণতন্ত্রটা কিভাবে আনা যায় তা চিন্তা করতে হবে। কিন্তু এখানে দুই নেত্রীর অবস্থান খুব শক্ত, পার্টির সেকেন্ড-থার্ড ম্যান থেকে তাদের অবস্থান এত দূরত্বে যে তারা নিজেদেরকে সবরকম সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করেন। এই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার কারণে তাদের এক শ্রেণীর তোষামোদকারী সাইকোফ্যান সৃষ্টি হয়েছে। অনেক তোষামোদকারী নিজেদের নেত্রীর ব্যক্তিগত অনুসারী প্রমাণ করার জন্য তাদের অনেক রকম কানকথা বলে, অপ্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে নেত্রীদের গণতন্ত্র হতে সরিয়ে দিচ্ছে। এদের কথাই নেত্রীরা গুরুত্ব দিতেন, ফলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পার্টির মধ্যে সিদ্ধান্তগুলো হয়ে আসছিল না। জোটের নেত্রীদের দলের মধ্যে এই যে শক্ত ভিত এটাই গণতন্ত্রের জন্য সমস্যা করছিল। গণতন্ত্র হলো একটা সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত, Collective decision ই গণতন্ত্র। একক সিদ্ধান্তের চেয়ে দশজন মিলে সিদ্ধান্ত নিলে সেটা ত্রুটি বিচ্যুতি মুক্ত থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে। গত পনেরো বছরে দুই পার্টির মধ্যে আমরা এটা অনুধাবন করতে পারিনি। এখন এই ধাক্কা খাওয়ার পরে আমরা হয়ত ভবিষ্যতে এই ত্রুটি থেকে বের হয়ে আসতে পারব এবং গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে। এই লক্ষে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম চালাচ্ছেন। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে দেশ ও রাজনীতি দুর্নীতিমুক্ত করা এবং এ ব্যাপারে তারা আন্তরিক। তবে এটা করতে যেয়ে আবার দুর্নীতি বা অন্য কোন আইনবিরোধী কর্মকাণ্ড করা বা এরকম কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা বোধ হয় ঠিক হবে না। যেমন তাদের অনেক কার্যক্রম ভালোভাবে চলছিল তার মধ্যে আওয়ামী লীগের

সভানেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলাটা ঢুকে পড়া ঠিক হয়নি। এই মামলাটির মধ্যে দিয়ে সকল রাজনীতিবিদ ধাক্কা খেলেন। অন্যদিকে এই মামলার ফলে সরকারের দায়ের করা অন্য দুর্নীতির মামলাগুলো প্রশ্নবিদ্ধ হলো।

এই বিষয়গুলোতে সরকারকে আরো সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিতে হবে। আমরা চাই এ সরকার সফল হোক। সেনাবাহিনী আমাদের শেষ ভরসা, তারা বর্তমান সরকারকে দারুণভাবে সহায়তা করছে। এই সরকার যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয়, যদি ব্যর্থ হয়, যদি দুর্নীতি বন্ধ ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে না পারে তাহলে আমাদের দেশ তো মুখ থুবড়ে পড়বে। সুতরাং সরকারকে ক্রিটিসাইজ করার জন্য না, তাদের সাফল্য কামনা করেই বলছি সরকারকে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা ভিত্তি করে এগুতে হবে।

২০০০ : বড় বড় দুর্নীতির সঙ্গে শীর্ষ পর্যায়ের নেতা বা নেত্রীরাও জড়িত ছিলেন বিষয়টি তো ওপেনসিক্রেট। তবে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে দোষ কোথায়?

খোকা : স্বাধীনতার পরে বা গণতান্ত্রিক সরকার আসার পর দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী ও কার্যকর করা উচিত ছিল। গত সরকারের আমলে যাচ্ছেতাইভাবে একটা কমিশন গঠন করা হলো এবং কমিশনে এমন সব লোক নিয়োগ দেয়া হলো তাদের সম্পর্কে কর্নেল অলি আহমদের মন্তব্য, 'এরাই দুর্নীতি ছাড়া চলতে পারে না। এরা আবার কিভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধ করবে।' অথচ এই কমিশনটাকে খুব শক্তিশালী করে দেয়া উচিত ছিল। আমরা ঢাকা শহরের গুলশান, বনানী, বারিধারায় যেসব বাড়িঘর দেখি, বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য কল-কারখানা দেখি, এগুলো যদি আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখা যাবে যে ৯৫% মালিকের পক্ষে দেখানো সম্ভব হবে না তার প্রথম পুঁজিটা সে কিভাবে পেয়েছিল। কোন বৈধ প্রক্রিয়ায় কোথা থেকে পুঁজিটা সে সংগ্রহ করেছে। জানতে চাওয়া হলে ৯৫% লোকের পক্ষে মনে হয় এর সদুত্তর দেয়া সম্ভব হবে না। আমাদের মতো দরিদ্র দেশে পুঁজির বিকাশটা প্রাথমিক স্তরে এরকম হয়ে থাকে। তারপর এটা বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ হয়। চাকরির সংস্থান হয়। এটা ক্যাপিল্যাটিস্টল তত্ত্ব সে-তত্ত্বের বাইরে তো যাওয়া যাবে না। কিন্তু নিকট অতীতে যে বড় বড় দুর্নীতি হলো যেগুলোতে রাষ্ট্রের ক্ষতি হয়েছে। রাষ্ট্রের বাইরে পুঁজি পাচার হয়ে গেছে, যার কারণে রাষ্ট্রের বড় একটা পারচেজের গোলমাল হয়ে গেছে। এই বড় বড় বিষয়গুলোতে মনোযোগ দিতে হবে। সরকারের এজেন্ডা কমিয়ে আনতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার Each and everybody নিয়ে দৌড়ালে তো চলবে না। তাহলে তো আর লোকই থাকবে না। আমি মনে করি, বাংলাদেশে খুব কম ধনী আছেন যারা নিজেদের ধনী দাবি করতে কাস্টম ফাঁকি দেন নাই। ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেন নাই। এসব বিষয়ে যদি আমরা ধাবিত হই তাহলে আমাদের অনেক জরুরি কাজ বাকি থেকে যাবে।

দেশের অবস্থা বুঝতে হবে। আমরা যাই বলি না বলি। যতই বিএনপি ও আওয়ামী লীগের ত্রুটি ধরি আবার কিন্তু দেশের মানুষ এই দুই ভাগেই বিভক্ত। তাই এই দলগুলোকে যদি আমরা সর্বাত্মক আক্রমণ করতে থাকি, তাহলে তাদের যে বিশাল সমর্থকগোষ্ঠী রয়েছে তারা কিন্তু এই সরকারের প্রতি বিরূপ হবে। দেশকে এই ভাবে ভাগ করে তারা অন্য কাউকে দিয়ে কী দেশকে ভালো করে ফেলতে পারবে? এই পরিস্থিতি থাকবে বলে আমার কাছে মনে হয় না। সুতরাং দেশকে ঐভাবে বিভক্ত না করে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। আমরা '৭১-এ যেভাবে হয়ে গিয়েছিলাম। যা কিছু হয়েছে তা নিয়ে দু'দলের সঙ্গে সরকার আলাপ-আলোচনা করতে পারে। ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে। নেতাদের দুর্নীতির ব্যাপারে দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে বলা যেতে পারে এই বাড়িঘর, এই টাকা অবৈধভাবে আয় করেছে এগুলো রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে বলেন। মোট কথা বিএনপি ও আওয়ামী লীগের যে বিশাল গোষ্ঠী রয়েছে দেশটা গড়ার ক্ষেত্রে তাদের সবার সহায়তা লাগবে। তাদেরকে সঙ্গে নিয়েই দেশের উন্নয়ন করতে হবে। আর তারা যেন সঙ্গে থাকতে পারে সে সুযোগ রাখতে হবে। তাই ইউপি মেম্বার বা গ্রাম পর্যায়ের কমিটিতে যারা আছে তাদের দুর্নীতিও যদি খুঁজতে যাই তাহলে তাদের সমর্থনটা পাবার সম্ভাবনা থাকবে না। দেশ গঠনের ক্ষেত্রে বিএনপি-আওয়ামী লীগকে শত্রু পক্ষ ভেবে তাদের বাইরে রাখলে আমরা গ্রেটার ক্যানভাসে যেটা দেখতে চাই দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, দেশকে একটা সুষ্ঠু বিকাশের দিকে নেয়া, এগুলো বাধাগ্রস্ত হবে।

২০০০ : দুই নেত্রীকে বাইরে রেখে রাজনীতির কথা বলা হচ্ছে তা কতটুকু সম্ভব?

খোকা : গত ১৫ বছরের তিনটা সরকারের অভিজ্ঞতা থেকে কেউ কেউ এ ধরনের কথা বলছেন। যেটা আগেও বললাম যে, দুই নেত্রীর মধ্যে যে অনমনীয়ভাব, দলের মধ্যে গণতন্ত্রচর্চা না করা, কালেক্টিভ ডিসিশন না নেয়া, ডিসিশন নেয়ার ক্ষেত্রে কট্টরদলীয় স্বার্থকে গুরুত্ব দেয়া– এই বিষয়গুলো থেকে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। আমি মনে করি, তারা নিজেরাও সংশোধন হতে পারেন। দল পরিচালনার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে এই বিষয়গুলো পরিত্যাগ করতে পারেন। গণতন্ত্র বুঝতে হবে, গণতন্ত্রে আমি একা করতে চাইলে হবে না, এটা আমার একার দায়িত্বও নয়। পার্টির আমি চেয়ারপার্সন হই বা সেক্রেটারি হই, আমার একার তো সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা নেই। একটা নিয়মনীতি আছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তো বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কর্তৃক রাষ্ট্র পরিচালনার শ্রেষ্ঠ পন্থা হিসেবে স্বীকৃত। দুই নেত্রী বা দুই দলের এটাকে লালন-পালন করার ত্রুটির জন্য এ ব্যবস্থা যে ত্রুটিপূর্ণ সেটা বলা ঠিক হবে না। পরিবারতন্ত্র আমরা যতই বলি, এখন তাদের প্রতি জনগণের আস্থা থাকলে অন্যেরা কী করতে পারে? আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের দিকে যদি তাকাই তাহলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হয়। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের দেশ ভারত। ধারাবাহিক গণতন্ত্রের মধ্যে আছে তারা। কিন্তু তারপরও দেখা যায় যে, আজকে কংগ্রেসকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে গান্ধী-নেহেরু পরিবারের উপর ভিত্তি করে। এরকম একটা বিষয় আমাদের এখানেও আছে যে, আওয়ামী লীগ মানে শেখ মুজিব পরিবারের নেতৃত্ব। তবে সময়ই এটার সমাধান দিতে পারে। আমাদের কারও আগাম কোনো কিছু এ পর্যায়ে বলা ঠিক হবে না।

২০০০ : দীর্ঘদিন থেকেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে যে, সরকারের তরফ থেকে আপনাদের নেত্রী খালেদা জিয়াকে বাইরে চলে যাবার কথা বলা হয়েছে। আপনি কি বিষয়টি জানেন?

খোকা : এ বিষয়টি পত্রপত্রিকায় মুখরোচক আলোচনায় আছে। উনাকে বাইরে পাঠানো বা রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেয়া সেটা হচ্ছে আইসোলেটেড করা। বিষয়টি সরকার এখনো স্পষ্ট করে বলেননি। কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী এটা জনগণের মধ্যে আলোচিত হচ্ছে। যাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তিনিই এর সঠিক জবাব দিতে পারবেন। কিন্তু আমার মনে হয়, এখন যেহেতু ঘরোয়া রাজনীতি বন্ধ, আমি আমার প্রেক্ষাপট থেকে বললাম কিন্তু এত বড় একটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের দলের নেতৃবৃন্দের মতামত জানার সুযোগ নেই। তাই এগুলো সম্পর্কে সময়ের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

২০০০ : মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে বিএনপিকে পুনর্গঠিত করার চিন্তা করা হচ্ছে এবং সে প্রক্রিয়ায় আপনার নামটাও যুক্ত আছে। এই গুঞ্জন সর্ম্পকে আপনাদের বক্তব্য কি?

খোকা : যেহেতু রাজনীতি এখন একদমই বন্ধ, কোনোরকম আলাপ আলোচনা করা যাচ্ছে না। সামগ্রিক অবস্থা অনেকে অনেক ভাবে বিবেচনা করেন। আমাদের কোনো এমপি বিপদে আছেন, কেউ ব্যক্তিগতভাবে মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে আছেন, নানান দিক থেকে অসন্তোষ আছে। আবার পার্টির ভেতরে পর্যালোচনা হচ্ছে, কেন আমরা দল ও দেশকে এই পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ করলাম। এ রকম আলোচনার ধারাবাহিকতায় পার্টির নেতৃত্বের ব্যর্থতার প্রশ্ন আসে। পার্টির মধ্যে আলোচনা হয় আমরা নির্বাচনটা সম্পন্ন হওয়ার মতো পরিস্থিতি রাখলাম না। বিএনপি সর্বশেষ ক্ষমতায় ছিল তাই নির্বাচনের পরিবেশ ঠিক করার দায়িত্বটা আওয়ামী লীগের চেয়ে বিএনপির ওপর ছিল বেশি। এই ব্যর্থতার দায়িত্ব আমাদের ওপর আসে যে, আমরা নির্বাচন কমিশন ঠিকভাবে গঠন করতে পারিনি। আমরা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করেছিলাম বলে চার উপদেষ্টা পদত্যাগ করলেন। তারপর রাষ্ট্রপতি ও উপদেষ্টাদের মধ্যে সংঘাত হলো। মোদ্দাকথা আমাদের, অর্থাৎ বিএনপির সমস্যার শুরুটা কোথায়। যেখানে ২০০১ সালে আমাদের জন্য একটি উদাহরণ থাকল যে, আওয়ামী লীগ নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে সবরকম প্রতিষ্ঠান- প্রশাসন, এমনকি আর্মি, পুলিশ সবকিছুই তাদের মনমতো সাজিয়ে গেল। তারপরও ঐ ৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসনের কারণে জনগণ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে বিএনপিকে চারদলীয় ঐক্যজোটকে নির্বাচিত করেছে। নির্বাচনে জনগণের শক্তি, জনগণের মূল্যায়নটাই প্রধান। নির্বাচন কমিশনে কে থাকল, কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের প্রধান কে হলেন, পুলিশে কে থাকল– এগুলো কিন্তু ইমমেটিরিয়াল ছিল। মানুষ সুযোগ পেলে সঠিক জায়গায় ভোট

দেয়। এই উদাহরণটা বিশেষ করে আমাদের নিকট থাকা সত্ত্বেও আমরা সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের বয়স ২ বছর বাড়ালাম, যাতে